International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 46-58
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বিশ্লেষণের আলোকে রমাপদ চৌধুরীর কয়েকটি গল্প

সত্যজিৎ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Ramapada Chowdhury who are well known by 'Galpakar of Middle Class Bengali People'. He was born on 1922, in the city of Kharagpur, undivided of district Midnapore. This time, The British Government ruled over the whole Indian. The decade of 1940, when 'The second world war' war occured and all the Indian was suffered by this 'war', then he was came into Bengla Sahitya and wrote many novels and short stories, fundamentally based by middle class people. He is alive now.

স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটগল্পের লেখকরূপে রমাপদ চৌধুরী বিশেষভাবে পরিচিত। অপেক্ষাকৃত প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসা এই কমকথা বলা লেখককে বাংলা সাহিত্যের অগুনতি পাঠক তুলনামূলক কম চিনলেও যারা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক তাঁরা সকলেই স্বীকার করে নেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নানামুখি বৈচিত্র্যকে। তাঁর সাহিত্য সম্ভার বিপুল না হলেও স্বল্পের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি গল্প-উপন্যাস স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। দীর্ঘজীবী বর্তমানে অশীতি এই স্বভাব নিঃসঙ্গ মানুষটি বহুকাল হয়েছে লেখালিখি থেকে পাকাপাকি অবসর নিয়েছেন। এটাও সত্য, সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা দেড়'শ পেরোয় নি। উপন্যাস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না। আসলে কোনদিনই তিনি তাঁর লেখালিখিকে একঘেয়েমি হতে দেননি। লেখালেখি তাঁর কাছে পেশার চাইতেও অবসর যাপনের সঙ্গী বেশি করে। অবশ্য তিনি একজন ভালো লেখক হওয়ার পাশাপাশি ভালো পাঠকও। অগুনতি বই পড়েছেন। সাহিত্য-অসাহিত্য কোন কিছুই বাদ যায়নি তাঁর পাঠ্য তালিকা থেকে। উত্তরাধিকার সূত্রে উচ্চমেধা ও স্মৃতির অধিকারী হলেও তাঁর পরিবারের পূর্বজরা কেউই সাহিত্যিক নন। লিখতে লিখতে লেখক হয়েছেন তিনি। পরিণত বয়সে পৌঁছে ফেলে আসা, দেখে আসা জীবন থেকে সাহিত্যের রসদ খুঁজে নিয়েছেন তিনি। যদিও লেখালিখির হাতেখড়ি একেবারে বাল্যবয়সে।

মধ্যবিত্ত বাঙালির রূপকার হিসাবে অবিসংবাদিতভাবে সু-চিহ্নিত এবং প্রশংসিত রমাপদ চৌধুরী। তাঁর মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল – 'উদয়াস্ত'। এই আলোচনার প্রথম অংশে আমরা ক্রমান্বয়ে তাঁর মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করব। আর পরবর্তী তথা শেষাংশে চর্চা করা হবে তাঁর অনগ্রসর উপজাতি মানুষকেন্দ্রিক গল্পগুলিকে নিয়ে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের যথার্থ রূপকার রমাপদ চৌধুরী—

'উদয়াস্ত' (১৩৫০) এই শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পসমগ্রের প্রথম গল্প এটি। চাকুরিজীবি মধ্যবিত্ত বিষ্ণুরামের কাহিনি 'উদয়াস্ত'। রমাপদ'র ফেলে আসা, দেখে আসা জীবন অভিজ্ঞতার এই মরমী আখ্যানে রেলকর্মচারীর জীবন কাহিনি উপজীব্য হয়েছে। নামবিহীন কোন অখ্যাত জনবিরল স্টেশনের স্টেশনমাস্টার বিষ্ণুরাম। বদলির চাকুরি। স্বজনহীন-অবাঙালি দেহাতি পরিবেশ। ঘরে আর কর্মস্থলে বৈচিত্র্যহীন সময় সরণীতে রুটিন মাফিক জীবন বিষ্ণুরামের। একঘেয়েমি অলস অথচ নিরবিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত বিষ্ণুরামের বিতৃষ্ণ মানসিক বিপর্যস্তের দিকটি গল্পকার চমৎকার বলেছেন—

> "পৃথিবীতে যে আরও মানুষ আছে তা মনে করিয়ে দেয় 'আপ' আর 'ডাউন' ট্রেন দুখানা। ... বিষ্ণুরামের জীবনে আছে শুধু অপেক্ষা। সূর্যোদয় মনে পড়িয়ে দেয় সন্ধ্যার কথা, আর সন্ধ্যা-রাত্রির।"[১]

সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্তের মানসিকতা বিষ্ণুরামের। নিয়মের ত্রুটি দেখিয়ে 'মাছ ব্যবসায়ী'র থেকে মাছ আদায় করে নেয় সে। এই কাজে তাকে পূর্ণ সহায়তা করেন আরেক সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত টি.সি. সত্যেন। বিষ্ণুরাম ভীরু প্রকৃতির। স্ত্রী সাবিত্রী সংসারের প্রয়োজনীয় 'ছাকনি' আনতে আইসভেন্ডারকে বলার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করলে বিষ্ণুরামের ভীতি সন্ত্রস্ত মনের পরিচয় পাই। সেইসঙ্গে বিত্ত এবং সামাজিক স্তরে নীচের শ্রেণীর প্রতি তার উন্নাসিক মনের কথাও জানতে পারি। নিজের থেকে বিত্ত এবং সামাজিক ব্যবধানে নীচে অবস্থান করা মানুষজনের প্রতি তার তাচ্ছিল্য সহ সহাস্য উক্তি—

> "তুই ব্যাটা ভোজন করছিলি কি রে? ভোজন করবে বর্ধমানের মহারাজা, আমি করব আহার, তুই ব্যাটা খাবি।"[২]

অলস একঘেয়েমি জীবনে অভ্যস্ত এই মানুষটি দিনের অল্প কিছুক্ষনের অবসর বিনোদনের জন্যে প্রায়ই সহকর্মী শিবুর বাসায় যায়। ফিরে এসে স্ফূর্তি মনে অভ্যাসের দাস এই মানুষটির জেগে উঠে পুরনো হারিয়ে যাওয়া রোমান্টিকতার আমেজ। প্রগাঢ় আগ্রহে স্ত্রীকে আলিঙ্গনের মধ্যে তৃপ্তির আস্বাদ খোঁজে। কিন্তু যৌবন উত্তীর্ণ স্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ব্যথা পায় এই প্রৌঢ় প্রায় মানুষটি। স্ত্রী সলজ্জ অথচ স্পষ্টভাবে বলে—

> "লজ্জা করে না তোমার! বুড়ো হতে চললে এখনও ওইসব?"[৩]

'বুড়ো হতে চললে' এই কথাটি বিষুরামের মনে বেশি করে বাজে। ফেলে আসা অতীতের স্বপ্নমধুর দিনের স্মৃতিমন্থন করে বিষ্ণুরাম। যৌবনের কথা মনে পড়ে। নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন মানুষটির মনে আসে কত কথা। একবার সাবিত্রী তাকে লিখেছিল—

> "চিঠির শেষে তুমি যা চেয়েছ, তা কি চিঠিতে দেওয়া যায়, একদিন এখানে এসে নিয়ে যেয়ো।"[৪]

সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে আর ভাবে বর্তমানের কথা। হতাশা আসে। আবার এই বিষ্ণুরামই দায়িত্বশীল পিতা। ছেলেকে টেলিগ্রাফি শিখিয়ে ভবিষ্যত গড়ে দিতে চায়।

সংসারে একক উপার্জনসক্ষম তিনি। অথচ প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পা রাখা এই মানুষটির সংসারে গুরুত্ব কমতে থাকে। নিজেকে মনে হয় কেবল মাত্র প্রয়োজনের চাকর। স্ত্রীর চোখে বিগত দিনের ভালোবাসা নেই। ছেলে-মেয়ে তাকে মানতে চায় না। এ সব ভাবতে কষ্ট হয় তার। সে ভাবে অন্যকথা। বিশ বছর আগের স্বপ্নের সঙ্গে বর্তমানের কঠিন বাস্তবের আপোস করতে গিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে তার। জীবন পথ অনেকটা পার করে এসে সংসার ভারে ন্যুব্জ, পত্নীপ্রেম বঞ্চিত, সন্তান থেকে নিরব অবহেলা সম্বল এই মানুষটি কাজের মধ্যেই তাই সান্ত্বনা খোঁজে। মধ্যবিত্ত প্রৌঢ়ের জীবনের চলচ্ছবি আলোচ্য গল্পে রমাপদ নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

শিল্পপতি মোহনলালের গল্প **'রত্নকূট'** (১৩৫২)। উচ্চবিত্ত সফল মোহনলাল গল্পটির কেন্দ্রে অবস্থান করলেও মধ্যবিত্ত যুবক অমলেন্দুও অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। 'সৌদামিনী আয়রন ওয়ার্কস'-র একক অধিপতি বাণিজ্যচালক মোহনলাল তিন সন্তানের পিতাও। বর্তমানে প্রৌঢ় মোহনলাল যৌবনেই পত্নীকে হারিয়েছেন। স্নেহশীল, দায়িত্ব ও সমাজ সচেতন পিতা মোহনলাল দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। বড় মেয়েকে ভালো পাত্রে বিয়ে দিয়েছেন। উদার ও স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী মোহনলাল একমাত্র পুত্র শোভনকে স্ব-ইচ্ছায় বিলেতে পাবলিসিটি শিখতে যাওয়ায় বাধা দেয়নি। স্নেহের ছোট মেয়ে অলকা তার প্রাণাধিক—

> "মোহনলালের অতৃপ্ত চোখ চেয়ে চেয়ে দেখে, একটি অস্ফুট ফুলের মতো ছোটমেয়ে অলকা তিল তিল করে ষোলো কলা পূর্ণ হবার দিকে এগিয়ে চলেছে।"[৫]

সমাজ সচেতন দায়িত্ববান সংযমী মোহনলাল মধ্যযৌবনে স্ত্রীকে হারিয়ে দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ নারী বর্জিত জীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ অবচেতন মনে জৈবিক চাহিদা উঁকি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই পথে অন্তরায় হয়েছে সমাজ-সংস্কার-স্ট্যাটাস ও স্নেহশীল পিতৃসত্ত্বা। অথচ প্রবৃত্তির প্রবল টানে মাঝে মাঝে তার মনে হয়—

> "কেমন যেন লাগে, ফাঁকা-ফাঁকা। অন্ধকার হলেই কে যেন বুকের ভেতর থেকে একমুঠো মাংস টেনে বের করে নেয়, কেমন যেন ফুসফুস কেঁপে ওঠে। একা মনে হয় নিজেকে, ছটফট করেন, বিছানায় গড়াগড়ি দেন এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। ফুলের মতো নরম বিছানা, তবু শুয়ে অস্বস্তি লাগে। মৃত মহালক্ষ্মীকে মনে পড়ে, স্ত্রীর প্রেতাত্মাটা যেন তাঁর চারপাশে চক্র কাটে। ধরা দেয় না। মাঝে মাঝে মোহনলাল মনে করেন, তাঁর ভুল হয়েছে। মহালক্ষ্মীর আসনটা আর কাউকে না দিয়ে জীবনটা ব্যর্থ করে তুলেছেন কিন্তু লজ্জা হয় যে! অবন্তী, অলকা, শোভন। কি করে মুখ দেখাবেন তিনি সমাজে?"[৬]

আর এসবের তর্জনিকে ভয় করে মোহনলাল। অথচ ভেতর ভেতর একটা চাহিদার বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে চাইছে।

কিন্তু এরপরও সফল ভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করেছেন মোহনলাল। কারখানার সৎ পরিশ্রমী নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী যুবক অমলেন্দুকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না বিচক্ষণ মোহনলালের। অমলেন্দুর মতো ছেলেকে বড় করে তুলতে ইচ্ছে হলেও জামাই করার কথা ভাবতেই পারে না তিনি। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সচল এবং উচ্চতার শৃঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অমলেন্দুর মতো যুবককে তার চাই। মধ্যবিত্ত অমলেন্দু মালিকের অনুগ্রহে নিজের স্বপ্নের পরিধিকে আকাশ করে তোলে। যদিও অচিরেই আমলেন্দুর স্বপ্নের উড়ান ভেঙে পড়ে। সচেতনতার চাবুকে অমলেন্দুকে মোহনলাল বুঝিয়ে দেন উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের তফাৎ। স্বপ্নভঙ্গে অমলেন্দুর আপসোস হয় 'ডিজাইনের পেটেন্টটা' প্রভু মোহনলালকে নিঃস্বার্থ ভাবে দান করার জন্যে। আপসোস, হতাশা, পরিশেষে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আপোস করে মধ্যবিত্ত অমলেন্দু নতি স্বীকার করে।

প্রৌঢ় কিন্তু সুঠাম দেহের অধিকারী মোহনলালের দীর্ঘ নারী বিবর্জিত জীবনে শুরু হয় প্রবৃত্তির প্রবল চাপ। মন আর ইন্দ্রিয়ের যে 'ইচ্ছা কীট' এতকাল সমাজ, সংস্কার আর পিতৃসত্তার কাছে সংযমে বাঁধা ছিল এখন তা ভাঙার উপক্রম হল। অবদমিত ইচ্ছার প্রবল চাপে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব মেনে নিলেন। ঈডিপাস কমপ্লেক্সের তাড়নায় চঞ্চল হয়ে উঠল তার মন। বেশ রাত করে ফিরেছেন মোহনলাল। আর দু'দিন বাদে অলকার বিয়ে। এবার সত্যিকার ক্লান্তি নামবে জীবনে। এইসব নানাকিছু ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন। মনের বিচিত্র খেয়ালে রাতের অন্ধকারে মেয়েকে ঘুমন্ত দেখে হঠাৎ—

> "মোহনলালের শরীরে শিরা-উপশিরাগুলো যেন কেঁপে উঠল। অলকা এত সুন্দর। মহালক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর! অথচ চোখে পড়েনি তাঁর?"[৭]

পিতৃসত্তার তীব্র ধাক্কায় বেরিয়ে এলেন। তাই শরীরী যত জ্বালা, কামনার আগুনে দগ্ধ করতে বেছে নিলেন লোকলজ্জার থেকে নিরাপদ নাতনি ভক্তির আয়া পাহাড়ি মেয়ের 'লাল গুলবাহার আঁট আঙিয়ার' বাঁধনে চোখ ঝলসানো স্বাস্থোজ্জ্বল নারী শরীরকে। গল্পের শেষে ঐ আশ্রিত নারীর আত্মসমর্পণের মধ্যে অর্থ-ক্ষমতা-প্রতিপত্তির বিনিময়ে নারীর ইজ্জত ক্রয় এবং প্রবৃত্তির আধিপত্য লেখক বুঝিয়ে দেন।

প্রাক্-স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে **'সহযোগ'** (১৩৫২) গল্পটি রচিত। গল্পটির কাহিনী সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের লড়াই নিয়ে। শাসক ও শাসিতের গল্প। শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কর্ণেল জনসন এবং মধ্যবিত্ত দুটি পরিবার বীরেন-অমিতা, শিবনাথ-রাণীর কথা এই গল্পের প্রতিপাদ্য। আবার মধ্যবিত্তের মধ্যে 'উচ্চ' আর 'নিম্ন' এই দুইয়ের পার্থক্যও দেখিয়েছেন লেখক। তুলনামূলক উচ্চ মধ্যবিত্ত বীরেন-অমিতের সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার শিবনাথ-রাণীর সামাজিক স্তরভেদও স্পষ্ট করেছেন গল্পকার।

বাবুলডিহির ডিরেক্টর কর্ণেল জনসনের প্রবল প্রতাপের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। এক হাত ও এক চোখহীন বীভৎস দর্শন কর্নেল জনসনের খামখেয়ালিপনা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকটি ভয়ানক। তিনি চাইলে কাউকে যেমন সর্বস্বান্ত করতে পারেন তেমনি দেহাতি মেয়ে থেকে ভদ্রলোক ঘরের বউ পর্যন্ত তার ইন্দ্রিয় লালসার শিকার হতে পারে। ভয় আর অর্থের বিনিময়ে মানবিকতার লুণ্ঠনকারী এই মানুষটি আগাগোড়া রহস্যে ঘেরা। তার বীভৎসতার চূড়ান্ত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন—

> "—বাবুলডিহির ডিরেক্টর জনসন। যার একটা কলমের খোঁচায় আট'শ টাকা বেতনের অফিসারের চাকরি বরখাস্ত হয়ে যায়, খেয়ালের মাথায় যে ষাটকে সাত'শ করতে পারে, কামধেনুর মতো যা কিছু মঞ্জুর করতে পারে যে। বাবুলডিহির উই-পিঁপড়েগুলোও জানে, উপকার না হোক অনিষ্ট কতখানি করতে পারে চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন।"[৮]

এদিকে বীরেন ও অমিতার ন্যায় তুলনামূলক উচ্চ মধ্যবিত্তের 'মেকি' স্ট্যাটাস, জীবনযাপন ও সুখনিদ্রার মূলে আছে 'তিরানব্বই টাকার চাকরি'। নিজেদের থেকে এক ধাপ নীচে নিম্ন মধ্যবিত্ত, প্রতিবেশি শিবনাথ ও রাণীর পরিবারের প্রতি চরম উদাসীন এবং তাচ্ছিল্য ও চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে, রাত্রের অন্ধকারে বীরেন যখন শিবনাথের বুড়ো বাবার প্রসঙ্গে বলে 'পটল তুলল বোধহয়', তখন চিনে নিতে অসুবিধা হয় না সমাজের এই বিশেষ শ্রেণীটিকে। এদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শিবনাথের মনেও সুখ নেই। রাণীকে ঘিরে সারাক্ষণই অকারণ সন্দেহের বিষবাষ্পে জ্বলে পুড়ে ছারকার তার মন। প্রতিবেশী বীরেন-অমিতার সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও অর্থের প্রাচুর্যে ঈর্ষান্বিত শিবনাথ। নিত্য অভাবের সংসারে মুখ বুঝে থাকা রাণী কখনো টুকিটাকি দরকারে পাশের বাড়ি গেলে শিবনাথের অসহ্য লাগে। বীরেনের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে জড়িয়ে কুৎসা দিতেও সংকোচ বাধে না। এভাবেই নিম্ন মধ্যবিত্তে পরিবারে ক্রমশ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকে দ্রুত হারিয়ে যায় শ্রদ্ধা। প্রাক-বিবাহের রোমান্স এবং বিবাহ-র অল্প পরে স্বপ্নমেদুর দিনগুলি ঝাপসা হয়ে তারা দূরে সরে যেতে থাকে। তৈরি হয় মানসিক ব্যবধান। তখন তারা যেন অন্য গ্রহের বসিন্দা।

আর যারা শিবনাথের মতো প্রায় উদাসীন ভবঘুরে অলস, অথচ অনবরত মানসিক ও সংসারিক চাপে পিষ্ঠ অসহায় উপায়হীন মানুষ, তারা তুচ্ছ কোন অবলম্বনকে আঁকড়ে আত্মসান্ত্বনা খোঁজে। শিবনাথও তার একঘেয়েমি আর অসহ্য সময় কাটানোর উপায় বের করে নেয়। 'দেখার নেশা' শিবনাথের। এই দেখার নেশাতেই একদিন শিবনাথ আবিষ্কার করে বীরেন-অমিতার সুখের আসল চাবিকাটি। কর্নেল জনসনের বাংলো বাড়ি থেকে অমিতাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ফেলে শিবনাথ। বুঝতে বাকি থাকে না বীরেন-অমিতার সুখের চাবিকাঠির মূলরহস্য। অমিতার নারীত্বের বিনিময়ে বীরেনকে কিনে নিতে হয় সুখ, আনন্দ, স্ট্যাটাস ও পদোন্নতি। সাফল্যের সিড়ি গড়তে হয় আত্মসম্মান বিসর্জনের মূল্যে। বীরেন-অমিতার এই সত্যিকারের পরাজয় আবিষ্কার করে শিবনাথ খুঁজে পায় বেঁচে থাকার নতুন রসদ। নিজেকে তুচ্ছ না মনে করে মাথা উঁচু করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করে সে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত যখন স্ব-শ্রেণী এমন কি নিজের থেকে নীচে অবস্থানকারী মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায় তখন অসহায় বোধ করে। তাই সামাজিক লজ্জার আশঙ্কায় শিবনাথকে বীরেন অনুরোধ করে, দেখে ফেলা ঘটনা কাউকে না বলার জন্যে।

গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর এই গল্প মধ্যবিত্তের শ্রেণী পরিচায়ক। আবার মধ্যবিত্তের মধ্যে দুটি শ্রেণী উচ্চ আর নিম্নের স্বরূপ চিনিয়েছেন তিনি। প্রাক-স্বাধীনতাকালীন মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট, জীবিকা হীনতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা ও সময় সংকটের গল্প 'সহযোগ'।

ছা-পোষা মধ্যবিত্তের গল্প '**কুসীদাশ্রিত**' (১৩৫২)। চাকরিজীবী সাত সন্তানের পিতা জ্যোতিষবাবু এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বদলীর চাকরিতে চিরকাল বাসা বদলাতে হয়েছে। অবসরের পাঁচ বছর আগের সময়ের চিত্র গল্পকার ধরেছেন। জ্যোতিষবাবু চাকুরিতে ঢুকেছিলেন ষাট টাকায়, এখন পাচ্ছেন পনেরো'শ। সময়ের সাথে অর্থনৈতিক অবস্থা বদলেছে, বদলেছে জীবনযাত্রার ধরণ। বদল হয়নি শুধু চিরকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা। তাই ভাড়াটে জ্যোতিষবাবুও নিজের ছেলেমেয়েদের মিশতে দেয়নি বাড়িওয়ালার পরিবারের সঙ্গে। এই গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি এঁকেছেন লেখক। চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত পিতা যথাসম্ভব চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও বদল হয়েছে জ্যোতিষবাবুর। নিম্ন মধ্যবিত্ত জ্যোতিষবাবু আজ তাই স্বপ্ন দেখেন উচ্চ মধ্যবিত্তে উত্তরণের। ইচ্ছে করলে বাড়িওয়ালাকে তিনিও দেখিয়ে দিতে পারেন কলকাতার বুকে বাড়ি হাকানোর সঙ্গতি তার আছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মধ্যবিত্তের পরিবারের ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে তাদের একটা অবস্থানগত ও প্রজন্মগত দূরত্ব বাড়তে থাকে। জ্যোতিষবাবুর পরিবারের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। বিবাহিত বড় ছেলে লক্ষীনাথ চায় বাবা মাকে ছেড়ে দূরে নিরিবিলিতে থাকতে। বউ দেখতে সুবিধার নয় তাই অসন্তুষ্ট মেজ ছেলে অতুল কাজের ছুতোয় প্রায় ঘর ছেড়েছে বলা চলে। আর ছোট ছেলে সূর্যেন্দু তো রীতিমত বিদ্রোহ করে বসেছে ভিনজাতের মেয়েকে বিয়ে করে জ্যোতিষবাবুকে ত্যাজ্য পিতা করে।

মধ্যবিত্তের অনেক স্বপ্ন। মধ্যবিত্ত পিতা তাই ভাবেন ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলবেন। মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে দেবেন। জ্যোতিষবাবু ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন বটে কিন্তু মানুষ করে তুলতে পারেন নি। মধ্যবিত্তের আর এক বড় স্বপ্ন নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার। জ্যোতিষবাবুও স্বপ্ন দেখেন রিটায়োত্তর জীবনে নিজ বাড়িতে নির্বিঘ্নে শান্তিতে বাস করার। সম্ভাব্য এই বাড়ির প্ল্যান নিয়ে ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার মতের মিল হয় না। দেখা যায় মধ্যবিত্তের স্বপ্ন অধিকাংশেই সফল হয় না। স্বপ্নের যখন মৃত্যু হয় তখন হাতে বড় একটা সময় থাকে না। জ্যোতিষবাবুর ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে হিসাব মেলাতে পারছেন না তিনি। অবশেষে মরিয়া হয়ে ওঠেন একটা বাড়ি তৈরি করার জন্য।

সঞ্চয় মধ্যবিত্তের বড় বৈশিষ্ট্য। জ্যোতিষবাবু সারাটা জীবন শুধু সঞ্চয় করবার চেষ্টা করেছেন। সঞ্চয় করতেও পেরেছেন। উপার্জিত অর্থ আর সঞ্চিত অর্থে ছেলেদের পড়াশুনা যেমন করিয়েছেন তেমনি মেয়েদের বিয়েও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অবসরকালীন টাকা আর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নিজের একটা আস্ত বাড়ি তৈরির স্বপ্নও দেখেন তিনি। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তের ন্যায় তিনিও স্বপ্নের সৌধ নির্মাণ করেন। একের পর এক প্ল্যান আঁকতে থাকেন। জমি কেনার ভাবনা থেকে বাড়ি তৈরি নকশা শুধুই বদলায়, সাকার হয় না স্বপ্ন। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে জীবনের তরী এগোতেই থাকে। ভাবনা কিছুতেই থেমে থাকে না। ঘড়ির কাঁটাও থেমে থাকে না। কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ সস্তা খোঁজার মানসিকতায় কিছুতেই যেন প্ল্যান বাস্তবায়িত হয় না।

একসময় দেখেন বাড়ি তৈরির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অধিকাংশ মধ্যবিত্তের যেমন বেশির ভাগ স্বপ্ন সাকার হয় না ঠিক তেমন জ্যোতিষবাবুর বাড়ি তৈরির স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যায়। নির্মম বাস্তবের কঠিন কষাঘাতে বাড়ি তৈরির স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হয়। একেবারে কনিষ্ঠ মেয়ের বিয়ের চিন্তা, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ছেড়ে পুত্রদের অন্যত্র চলে যাওয়ার সুপ্ত বাসনা, অবসরকালীন জীবন কাটানোর অর্থচিন্তা 'বাস্তবের চোখ' খুলে দেয়। তাই শেষ জীবনে সন্তানদের প্রতি মোহভঙ্গ ও ব্যাথা ভরা

মন নিয়ে প্রৌঢ় পতি-পত্নী প্রায় নির্বান্ধব একমাত্র পরস্পর নির্ভরতায় জীবন ইতিহাসের বাকি পাতা উল্টায়। হয়তো কখনো লুকানো ব্যথা চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়। আর এভাবেই ভাগ্যের সঙ্গে আপোস করে বাকি দিনগুলি তাদের কাটে।

'জ্বালাহর' রচনাকাল ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ। দেশ স্বাধীন হয়েছে দশ বছর। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মোটামুটি ব্যর্থ। দেশের আর্থিক হাল বেহাল। মধ্যবিত্তের অবস্থা তথৈবচ। এমনই এক টালমাটাল অর্থনৈতিক আবহে একই বাড়িতে দুটি পরিবার বাস করে, ইন্দ্রনাথ-শ্যামলী এবং সুরঞ্জন-শিউলি। অবশ্য শ্যামলী ও শিউলি দুই বোনও বটে।

সুরঞ্জন-শিউলির অবস্থা তুলনামূলক সচ্ছল এবং প্রকৃতই তারা সুখী দম্পতি। অথচ আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথ-শ্যামলীকে সুখী মনে হলেও তারা যথার্থ সুখী নয়। কেননা মাতাল ইন্দ্রনাথ সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। নৃশংস, ক্রুর, হিংস্র মাতালের দৃষ্টিতে টলতে থাকা মানুষটি একেবারেই পাল্টে যায় রাতের অন্ধকারে। আবার দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ধোয়াতুলসী পাতার মতো নিষ্পাপ মনে হয় তাকে—

> "এ মিঠে মিতালির আয়ু সূর্যমুখী ফুলের মতোই দিনাবদ্ধ। শেষ রোদ্দুরের সঙ্গে সঙ্গেই উবে যায় শ্যামলীর সুখের শিশির।"[৯]

ইন্দ্রনাথের নেশায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন—

> "দিনের আলোয় শ্যামলী আর ইন্দ্র কত সুখী। হাসাহাসি, হই-হল্লা। ফূর্তিতে আর ফুরসতে যেন ডুবে আছে দুজনে। অথচ সূর্য নিবলেই নেশায় ডুবতে চায় কেন ইন্দ্রনাথ? সংসার ভুলতে চায় কেন? হ্যাঁ, যৌবনে কে যেন স্পষ্ট একটা ছবি এঁকে রেখে গেছে ওর মনে। মনের পটে দুলে দুলে ওঠে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রবঞ্চনার মূর্তি। তাকে ভোলবার জন্যেই হয়তো!"[১০]

শিউলি ভেবে পায় না এই দুর্দশা থেকে কিভাবে বোন শ্যামলীকে উদ্ধার করবে। ইন্দ্রনাথকে সুহৃদের মতো বলতে গেলে শ্যামলীর দুর্দশা বাড়ে বৈ কমেনা। শেষমেষ ভেবে চিন্তে শিউলি এক অভিনব পন্থা বের করল। ঠিক যে সময় ইন্দ্রনাথ শ্যামলীকে মারধর করে আর শ্যামলীর করুণ চিৎকার শোনা যায়, সেই সময়ে সুরঞ্জন মাতালের মিথ্যে অভিনয় ও শিউলি মিছিমিছি আর্তচিৎকার করে। যাইহোক সুরঞ্জন-শিউলির এই মিথ্যে অভিনয়ের দাওয়াই কাজে এল শ্যামলীর দুঃখময় জীবনে। যাই হোক সুরঞ্জন-শিউলির এই মিথ্যে অভিনয়ের দাওয়াই কাজে এল শ্যামলীর দুঃখময় জীবনে। বন্ধ হল ইন্দ্রনাথের অত্যাচার। ইন্দ্রনাথ এখন থেকে ঐ সময়ে উদগ্রীব হয়ে কান পেতে থাকে শিউলির আর্তচিৎকার শোনবার আশঙ্কায়।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্পকার মধ্যবিত্ত মানুষের অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় দেন। মানুষ নিজেও জানে না কোথায় কিভাবে সে সুখী। অনেকক্ষেত্রেই অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের লুকানো ব্যাথার উপশম সে খোঁজে। পূর্ব প্রণয়ের ব্যর্থতা, আর্থিক দুরাবস্থায় অসুখী মানুষ কষ্ট ভুলতে নেশায় ডুবে যেতে চায়। সময়ের সাথে সাথে কখনো সে নিজের অপকর্মের নৃশংসতা অপরের আচরণে আবিষ্কার করে শুধরে নেয়। বুঝতে পারে নিজের ভুল। অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসে। ঠিক যেমনটি হয়েছে এই গল্পে ইন্দ্রনাথের।

নিম্ন মধ্যবিত্ত দুটি ভাড়াটে পরিবারকে নিয়ে লেখা গল্প **'দুধের স্বাদ' (১৩৬০)**। যেখানে গ্রাসাচ্ছাদন প্রধান সমস্যা সেখানে বিলাসিতা স্বপ্ন বৈকি। তবুও ছ-মাসে, ন-মাসে এরাই সস্তা দামের টিকিট কেটে সিনেমা দেখে কিংবা বছরে এক আধবার কাছাকাছি আধবেলা-একবেলার ভ্রমণ সেরে অসম্পূর্ণ বিলাসিতা মেটানোর চেষ্টা করে। আবার কেউ বা গল্পের নিরুদির মতো সিনেমা হলের বাইরে দু'আনা দামের সিনেমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বই পড়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। পরে প্রতিবেশী মহলে সিনেমা দেখার মিথ্যে গল্প বলে নিজের বিলাসিতা জাহির করে। অথচ নিরুদি মানুষটি নিম্ন মধ্যবিত্তের অভ্যাসবশতঃ স্বামীর বেতন বাড়ার পরও সিনেমা দেখতে যেতে চায় না। যৌবনের বিলাসি শখ সময়ের সাথে সাথে শুকিয়ে গিয়েছে। এই গল্পে গল্পকার সংক্ষিপ্ত তুলির আঁচড়ে দেখাতে চেয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্তের হিসেব করে সংসার চালানো, বিলাসিতার স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে ভদ্রতার মুখোস পরে আত্মসম্মান বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টাকে।

'সম্ভব অসম্ভব' গল্পটির রচনা কাল ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। মধ্যবিত্ত পরিবারে একমাত্র রোজগেরে, বিবাহিতা নিরুপমার বাবার মৃত্যুর পর মা-ভাইকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হয় না। যে মা স্বামী বেঁচে থাকতে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর জন্যে তদ্বির করতেন, সেই মাও হয়তো মন থেকে চায় না মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাক। মধ্যবিত্ত কর্তব্য পরায়না নিরুপমা অপেক্ষা করে, ভাই মন্টুর বড় হয়ে সংসারের হাল ধরার। স্বামীগৃহে সংসার করার স্বাধ মেটে না নিরুপমার। একই মানসিকতায় স্বামী মানুষটিও নিরুপমাকে বাড়িতে এসে থাকার জন্যে জোর করতে পারে না। উভয়ে বাধ্য হয়ে সন্ধ্যারাতে অন্ধকার শহরে গলির মোড়ে, পার্কে, পর্দা ঘেরা চায়ের টেবিলে অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকার মতো গোপন অভিসার সারে। এমন জীবনে অস্থির হয়ে শাশুড়ির শরীর খারাপের অজুহাতে নিরুপমা দু'চার দিনের জন্যে পতিগৃহে যেতে চাইলে, মা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন— "যা

ভালো বুঝিস। তোর বাবা বেঁচে থাকলে কি...।"[১১] নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে গর্ভধারিণী মা-ও পরিস্থিতির চাপে বদলে যেতে বাধ্য হয়। সংসারের দেখভালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মা স্বার্থপর হয়ে পড়ে। মা তাই চায় না মেয়ে শ্বশুর গৃহে গিয়ে থাকুক। একদিকে শাশুড়ির অপবাদ, স্বামী সঙ্গতহীনতা অন্যদিকে আপন মায়ের স্বার্থপরতায় অভিমানি নিরুপমা সুখী হওয়ার পথ খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে এই রকম নিরর্থক জীবন যাপনের পরিস্থিতি আসতে পারে, সেই সত্যের সঙ্গে গল্পকার আমাদের পরিচয় করান আলোচ্য গল্পে।

মধ্যবিত্ত মানুষের নির্লজ্জ সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির গল্প '**মনবন্দী**' (১৩৬০)। বছর ছাব্বিশের স্কুল টিচার মিস সেন দূরপাল্লার ট্রেনে, থার্ডক্লাসের কামরায় কলকাতা ফেরার পথে অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আলাপমাত্র কেবল বাঙালিত্বের দোহাই দিয়ে নিজের মুশকিল আসান করেছে। নিজের টুকিটাকি যাবতীয় সবই চাপিয়েছেন কথক যুবকের কাঁধে। কথকের বয়সটা এমন, যে বয়সে কোন সুন্দরী যুবতীর যে-কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। ফেরার পথে মিস সেন শুধুমাত্র নিজের সুবিধাটুকু মিটিয়েই কথককে ছাড়লেন না, হাওড়া স্টেশনে নামবার পর সহযাত্রী বৃদ্ধ হেড পণ্ডিতকে বাসে তুলে দেবার দায়িত্ব সঁপলেন।

এই ঘটনার বছর তিনেক পরে ভাইঝিকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে মিস সেনের সঙ্গে কথকের আবার দেখা হয়ে গেল। বলা বাহুল্য মিস সেন এখন মিসেস ভট্টাচার্যই শুধু নয়, স্কুলের হেড মিস্ট্রেসও বটে। অবশ্য সে দিনের বছর একুশের যুবক অনেক পরিণত হয়েছেন। এবারেও মিসেস ভট্টাচার্য কথককে দায়িত্ব দিলেন সস্তায় ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে। কিন্তু আজকের বাস্তববাদী যুবক সুবিধাবাদী সুন্দরী বিবাহিত মহিলার কথার ফাঁদে পড়তে নারাজ। তখনকার মতো কথক এড়াতে পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে, মিসেস ভট্টচার্যের দেখা হয়ে যায়। মিসেস ভট্টাচার্য এক রকম জোর করে কথককে ধরে নিয়ে গেলেন। ভাড়ার বাসায় নিয়ে গিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ স্বামীর সাথে পরিচয় দিলেন। কথক চিনতে পারলেন, চারবছর আগের মিস সেনের সহযাত্রী বৃদ্ধ হেডপণ্ডিতই আজকের মিসেস ভট্টাচার্যের স্বামী। বাড়ীতে ডেকে সামান্য চা-এর সৌজন্য না দেখালেও মিসেস ভট্টাচার্য কথকের দায়িত্বে কিছুক্ষণের জন্যে বৃদ্ধ স্বামীর সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ সেরে নিতে চাইল। কথাপ্রসঙ্গে কথক, মিসেস ভট্টাচার্যের পরিশ্রম সম্বন্ধে সহানুভূতি জানালে মিসেস ভট্টাচার্য নিজের দৈন্যতা চেপে গর্বিত ভাবে বলেন—

"কি যে বলেন, ওঁর জন্যেই তো আজ ইস্কুলের টিচাররা আমাকে মান্য করে, ঈর্ষা করে, তা জানেন?"[১২]

নিজের থেকে বয়সে অনেক বড় বৃদ্ধকে বিয়ে করে মিস সেন বাইরের ঠুনকো গর্ব দিয়ে অন্তরের দীনতাকে ঢাকতে চেয়েছেন। গল্পের শেষে গল্পকার মধ্যবিত্ত মানুষের সুবিধাবাদী মানসিকতার পাশাপাশি মিথ্যে আভিজাত্য, অন্তঃসারশূন্য অহমিকার আড়ালে অসহায়তার দিকটি প্রকটিত করেন কথকের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে—

"মানুষ সুখী হতে চায়? না সুখে আছি, এ কথা জানিয়ে সুখী হয়।"[১৩]

'**ঈর্ষা**' গল্পটির রচনাকাল ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। ঈর্ষা মানুষের মজ্জাগত ব্যাপার। বিশেষ করে সংসারি মানুষের ক্ষেত্রে কথাটি ষোলোআনা খাঁটি। নদীর এ-কূল যেমন ও-কূলকে ঈর্ষা করে, ঠিক তেমন কমবেশি প্রত্যেক মানুষই একে অপরকে ঈর্ষা করে। আর্থিক অসাম্য, জীবনযাত্রার পার্থক্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির হেরফের, সন্তান-সন্তানহীনতা সবকিছুই ঈর্ষার বিষয়।

'ঈর্ষা' গল্পে বিগতদিনের কলেজ সহপাঠী দুই বন্ধুর সাক্ষাত হয়। একজন কলেজ শেষ না করেই বিয়ে করে অল্প আয়ের মধ্যেও গৃহীর সুখী জীবনে সন্তুষ্ট। অন্যজন উচ্চশিক্ষা শেষ করে কলেজের সহপাঠীনি প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে। দুজনেই চাকরি করার ফলে উভয়ে উভয়কে এতটুকু সময় দিতে পারে না। যেটুকু বা সময় অবশিষ্ট থাকে স্ট্যাটাস বাড়ানোর নেশায় সেই সময়টুকুও কাজে লাগাতে চায় তারা। স্বাভাবিকভাবে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তুলনামূলক আর্থিক সচ্ছল কথক অল্প আয়ের বন্ধু শান্তনুর বাড়ি গিয়ে গৃহস্থের ছবি দেখে ঈর্ষা করে। আবার শান্তনু বন্ধুর সচ্ছলতার গল্প শুনে নিজের আর্থিক অসঙ্গতির সঙ্গে তুলনা করে বন্ধুকে ঈর্ষা করে। এভাবেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা এবং নিজের নিজের সুখী অবস্থানের চিন্তা করে আত্মসান্ত্বনা খুঁজে পায় তারা। গল্পের মূল বক্তব্যটিও গল্পকার তুলে ধরেন এই জায়গাটিতেই।

মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সাধারণ মেয়ের গল্প '**আমি একটি সাধারণ মেয়ে**' (১৩৬৬)। যার শখ-আব্দার-স্বপ্ন সবকিছুই সাধারণ মাপের। ছেলেবেলায় আদরের আতিশয্য, কৈশোরে মা-বাবার শাসনের কড়াকড়ি পেরিয়ে যৌবনে উপনিত সেই সাধারণ মেয়েটি এখন পরিবারের গলার কাটা। আবার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে চিন্তামুক্ত বাবা-মা, মেয়েটির জন্যে একটু অধিক যত্নশীল হয়ে পড়ে। এতদিনের গলার কাটা মেয়েটি অবশ্য বিয়ের পর বাপের বাড়ি কখনো সখনো এলে খাটিয়ে নিতে চায় বৌদিকে। একটু বিশ্রাম করে নিতে চায়। কেননা শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়ে তাকেও যে বৌদির মতো সংসারের জোয়াল টানতে

হবে। তাই সাধারণ মেয়েটি সাধারণ ভাবনা চিন্তার বাইরে উদার ও মহৎ হতে পারে না। গল্পকারও এই সাধারণ মেয়েটির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাভাবিক ছবি দেখিয়ে দেন।

'**শুধু কেরানী**' গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে। স্বল্প বেতনের সরকারি-বেসরকারি অফিসের কেরানীদের নিয়েই এই গল্প। মোটামুটি সব অফিসের কেরানীকূলের রোজনামচা একসূত্রে বাঁধা। হাসি-ঠাট্টা, আড্ডা, পরচর্চা, অবৈধ প্রণয়, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, ঠুনকো আত্মমর্যাদা আবার উপর মহলের চোখরাঙানি এই নিয়েই কেরানীদের প্রাত্যহিক কর্ম জীবন। পার্থক্য বলতে, কেউ বা আপার ডিভিশন, কেউ বা লোয়ার ডিভিশন। মানসিকতা কিন্তু মোটামুটি একই। অফিসের কেরানীরা পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করলেও বাইরে বুঝতে দেয় না। সবসময় মুখে কৃত্রিম হাসির উপর মিষ্টি কথার কিসিমিস সাজিয়ে রাখে। কখনো সখনো সহকর্মীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে জড়িয়েও পড়ে এই কেরানীরা। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই কেরানীদের শখ-আহ্লাদ পূরণ হয় না। এমনভাবেই গতানুগতিক দিন যাপনের ভেলায় চড়ে কখন যে চুলে পাক ধরে কেরানীদের নিজেরাও জানতে পারে না। বাঁধাধরা দশটা-পাঁচটার জীবনই এদের নিয়তি। 'শুধু কেরানী' গল্পে রেকর্ড ক্লার্কের চাকরি করা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সন্ধ্যার আর বিয়ে করা হয় না। ঢলে পড়া যৌবনে, বিগত যৌবনের ফেলে আসা দিনের কথা ভেবে মাঝে মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে সন্ধ্যার।

অবশ্য আজকের দিনে বিশেষ করে সরকারি অফিস ক্লার্কের সঙ্গে রমাপদ-র গল্পে বর্ণিত কেরানীর তুলনা করা চলে না। দ্রব্যমূল্যের বেড়ে চলা বাজারেও একালের সরকারী কেরানীরা বৈধ-অবৈধ আয়ে দিব্যি চালিয়ে নিতে পারছে।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে '**লোভ**' গল্পটি রচিত হয়েছিল। কোথায় কতটা এবং কিভাবে বলা উচিত এ জ্ঞান সবার থাকে না। তাই ভুল জায়গায় বে-ফাঁস বলে মানুষ প্রায়ই নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে। একটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান কোন পর্যায়ে চলে যেতে পারে তারই গল্প 'লোভ'। অপ্রিয় সত্যভাষণের লোভ সংবরণ করতে না পেরে এই গল্পের নায়িকা, বাপের বাড়ির প্রশংসা শ্বশুর বাড়িতে আর শ্বশুর বাড়ির প্রশংসা বাপের বাড়িতে করে সকলের অপ্রিয় হয়েছে। অপ্রিয়, মিথ্যা বা বাড়িয়ে বলার লোভ সামলাতে না পারলে সংসারে শান্তির আবহ নষ্ট হতে পারে গল্পকার সে কথাই 'লোভ' গল্পে বলেছেন।

'**একটি মনি-ব্যাগ ও এক ফালি হাসি**' গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৩৭০ বঙ্গাব্দে। যৌথ পরিবারে অধিকাংশ সদস্য বিয়ের পর আলাদা থাকতে চায়। নির্ঝঞ্ঝাট সুখে থাকার স্বপ্ন ও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব এড়াতে ছোটখাটো অজুহাত সামনে রেখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে পরিবারের বড় বা ছোট ছেলেটি। অথচ ভাড়া বাড়িতে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে কাটাতে একঘেয়েমি মনে হয়। এই নিঃসঙ্গতা থেকে বেরিয়ে আসতে মধ্যবিত্ত ঐ বিচ্ছিন্ন পরিবার দিদি-জামাইবাবু, দাদা-বৌদি বা বৃদ্ধ বাবা-মাকে দু'চার দিনের জন্যে নিজেদের ঐ নিঃসঙ্গ দ্বীপে বেড়িয়ে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু হিসেব করে চলা স্বল্প আয়ের ঐ দম্পতির কাছে দু'দিনেই বেড়াতে আসা বাড়তি মানুষগুলি বোঝা হয়ে পড়ে। তখন তাদের অবস্থা অনেকটা 'গেলেই বাঁচি'। যতক্ষণ টাকার সমস্যা না থাকে ততক্ষণ বেড়াতে আসা মানুষগুলি তাদের কাছে আপন ও আনন্দের ফোয়ারা মনে হয়। আর টাকা ও দিন যাপনের চাকা গড়িয়ে চলার সাথে সাথে বাড়তি এই মানুষগুলি তাদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গল্পকারও এই গল্পে দেখাতে চেয়েছেন মানি ব্যাগে যতক্ষণ টাকা থাকে ততক্ষণই গৃহস্থের মুখে হাসি চওড়া থাকে। তারপর কখনো নয়।

মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখা গল্প '**বসবাস ঘর**' (১৩৭৪)। স্ট্যাটাস সচেতন মধ্যবিত্ত প্রথমত মাথা গোঁজার মতো একটা বাসস্থান করতে পারলে বসবাস করার মতো ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যৌথ পরিবারের দায়বদ্ধতায় মধ্যবিত্ত মানুষটি স্বার্থপরের মতো সাথে সাথেই উঠে আসতে পারে না নিজের তৈরি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কালচারে। আবার একই যৌথ বাড়িতে বাস করে নিজস্ব বসবাস ঘর তৈরি করে নিতে পারে না। তাই নিজের হীনমন্যতায় স্বাভাবিক হতে পারে না আশেপাশের আত্মীয়-বন্ধু কিংবা পরিজনের সাথে। এমনকি বাইরে থেকে নিকট কিংবা দূরস্থ আত্মীয় কিংবা বন্ধু স্থানীয় কেউ বেড়াতে এলে শুধুমাত্র বসবার ঘরের অভাবে অস্বস্তি এড়াতে পারে না। যেমনটি ঘটেছে এই গল্পের কথক ও তার স্ত্রী রেখার ক্ষেত্রে। নিজেদের হীনমন্যতায় তারা ভাবতে পারে না কারো বাড়ি বেড়াতে যাবার কথা। কেননা আত্মীয়রা বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে গেলে পাল্টা সৌজন্যে তাদেরকেও আসতে বলতে হয়। অথচ তাদের একটা বসবাস ঘর পর্যন্ত নেই। আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে অল্পে অসন্তুষ্ট মানুষ আরও পেতে চাওয়ার নেশায় প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। আবার নিজের সমান সঙ্গতির কিংবা জীবনযাপনে একধাপ নিচে বাস করা পরিচিত জনের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সহজ স্বাভাবিকবোধ করে এরাই। গল্পের কথক যখন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মান্ধাতা আমলের জীর্ণ বাড়ির একটি মাত্র ঘরে বাসকারী

পুরনো দিনের বন্ধু আলোকের সঙ্গে দেখা করতে যায় তখন নিজের ঘরের সঙ্গে প্রতি তুলনায় এতটুকু হীনমন্যতা হয় না তাদের। ছোট্ট এক টুকরো ঘরে বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর আন্তরিকতায় একেবারে সহজ স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

গল্পকার এই গল্পে একই অর্থনৈতিক বৃত্তে বসবাসকারী দুটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিন্ন মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজের দুই শ্রেণীটির অনেকেরই মনের কথা জানিয়ে রাখেন।

'**আলমারিটা**' গল্পের রচনাকাল ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। মধ্যবিত্তের অধিকাংশ ভদ্র হোক বা না হোক ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু এই লোক দেখানো ভদ্রতাই কখনো সখনো অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গল্পের কথক ভদ্রতার খাতিরে মামার রেখে যাওয়া প্রকাণ্ড সেকেলে আলমারিকে নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে জায়গা দিতে বাধ্য হয়। অথচ এই প্রায় ভালো মানুষটিও একটা সীমা পর্যন্ত ভদ্রতার আড়ালে থাকতে পারে। পরিস্থিতির প্রত্যাঘাতে ভেঙে পড়ে ভদ্রতা-অভদ্রতার সৌজন্যতাবোধ। কেবলই তার মনে হয় আলমারিটা ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। তার অবস্থা অনেকটা যেন— 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। বাসস্থান সংকোচ মধ্যবিত্তের কাছে এ একরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। তিনি আলমারিটা ব্যবহার করতে পারছেন না অথচ ঘরে জায়গা জুড়ে রয়েছে। স্বত্বাধিকার ব্যতিত মধ্যবিত্ত ত্যাগ স্বীকার করতে নারাজ। আসলকথা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে চিরচেনা পরিবেশ। ভদ্র-অভদ্রের মুখোশের আড়ালে মানিয়ে নিতে না পারলে সমাজে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ে। ঘর থেকে বারান্দায় বিরাট আলমারিটার স্থান বদলের মতোই গল্পের কথক ভদ্রতাকে বারন্দায় বের করে সুস্থ ও স্বাভাবিকবোধ করে। কথকের এই অবস্থান বদল মধ্যবিত্তের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখা গল্প '**ফ্রীজ**' (১৩৭৫)। মধ্যবিত্ত স্বল্প আয়ের মধ্যেও অল্প সল্প করে পয়সা বাঁচিয়ে কিনে ফেলতে চায় সৌখিন বিলাসী আসবাবপত্র। তার এই সৌখিনতা যতটা না প্রয়োজনের তার চাইতে অনেক বেশি করে লোক দেখানোর। প্রতিবেশীরা, আত্মীয়-পরিজনের চোখে ঈর্ষা দেখার আনন্দে হাজার কষ্ট উপেক্ষা করেও মধ্যবিত্তের কেনা চাই-ই সংসারের বিলাসী উপকরণ। যেগুলো এখুনি না হলেও চলতো সেগুলো ক্রয় করতে গিয়ে নিজের মনেই মধ্যবিত্ত মানুষটি সাজিয়ে নেয় একাধিক যুক্তি। অথচ দুঃখী নিকট আত্মীয় কন্যাদায়ে সাহায্য প্রার্থনা করলে পাশ কাটিয়ে যেতে চায় এই মানুষটি। নিজের ভেতর গোপন অনুভূতিশীল বিবেককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত মানুষগুলো নানান যুক্তির অজুহাতে চেপে রেখে আত্মসান্ত্বনা খোঁজে।

১৩৭৫ বঙ্গাব্দে '**শেষ বৃষ্টি**' গল্পটি লেখা হয়েছিল। সময়ের ভেলায় বয়সের তরী এগিয়েছে অনেকটা। মা মারা যাবার পর একটা ছোট্ট চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছিল জয়ন্তী। বৃদ্ধ অসুস্থ পিতাকে নিয়ে কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছিল তার। স্বল্প আয় হলেও জয়ন্তীর স্বপ্ন ছিল আকাশছোঁয়া। কেরানী সহকর্মীকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারেনি জয়ন্তী। কাঁচা বয়সে দু-চারটি সম্বন্ধ এলেও বিয়ে হয়নি তার। এখন আটাশ বছরে যৌবনের ভাটায় সম্বন্ধ আসে না বললেই চলে। রক্ষণশীল পরিবারের স্বভাব লাজুক মেয়ে জয়ন্তী কোন কালেই বিয়ের ব্যাপারে নিজে উপযাজক হতে পারেনি। যদিও বিয়ের আশা জয়ন্তী এখনো রাখে। ঠিক এই রকম একটা সময়ে জামাইবাবু জয়ন্তীর জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ আনে। সম্বন্ধের খবরে জয়ন্তীর মনে নতুন করে রঙের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু জয়ন্তীর বোধহয় ভাগ্যটাই খারাপ। যেদিন পাত্র পক্ষের জয়ন্তীকে দেখতে আসার কথা, সেদিন বাধ সাধলো প্রকৃতি। সকাল থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। তা সত্ত্বেও বিকেলের প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে জয়ন্তী অফিস থেকে সোজা তার দিদির বাড়ি চলে আসে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে জয়ন্তী এলেও এল না জয়ন্তীকে দেখতে আসবে বলে পাত্র আলোক ও তার পরিবার। আশায় আশায় অপেক্ষা করে জয়ন্তীকে শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসতে হল। এই ভাবে জয়ন্তীর জীবন থেকে আরো একটি সুন্দর স্বপ্ন সম্ভাবনাকে ধুয়ে দিয়ে গেল বিকেলের শেষ বৃষ্টি। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, পুনরায় আশায় বুক বাঁধার মধ্য দিয়ে জীবনভার বহন করে চলে।

'**ডাইনিং টেবল**' গল্পটির রচনাকাল ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। মডার্ণ জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত হাজার কষ্ট সহ্য করে দরকারি-স্বল্প দরকারি আসবাব ক্রয় করতে চায়। অথচ কিনে ফেলার পর তার আপশোস হয় না। আধুনিক জীবন যাপনের উপযোগী আসবাব ক্রয় করতে গিয়ে অনেকগুলি টাকা খরচ হয়ে যায় মধ্যবিত্তের। যার পরিণামে মাসের শেষে হাত টানাটানি। তার উপর আবার বাড়তি আসবাবপত্রে স্থানাভাবের সমস্যা তো আছেই। দুই কামরার ফ্ল্যাটে বাস করা মধ্যবিত্তের কাছে যা ছিল স্বপ্ন আর সৌখিনতা তাই এক সময় বাড়তি বোঝা ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটি হচ্ছে 'ডাইনিং টেবল' গল্পে।

'**ড্রেসিং টেবল**'-এর রচনাকাল ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা কথক 'আমি' মেয়েটি ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতো একটা ড্রেসিং টেবিলের অধিকারী হওয়ার। নিজের সম্পূর্ণ কায়াকে 'আমি' মেয়েটি দেখে নিতে চায়। সঙ্গতিহীন বাবা পারেনি মেয়ের আব্দার মেটাতে। মেয়েটি ছোট্ট আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধুমাত্র মুখ দেখেই সন্তুষ্ট থাকে, এমনকি

বিয়ের সময় দরিদ্র পিতার কাছ থেকে একটা ড্রেসিং টেবল চেয়েও পায় না মেয়েটি। ডেসিং টেবল না পেয়ে মনমরা মেয়েটি স্বামীর সোহাগ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে নিতে চায়। এদিকে মনের মধ্যে লালন করা বহুদিনের স্বপ্নকে পুষ্টি দিতে একটু একটু করে সঞ্চয় শুরু করল সে। অবশ্য দিনযাপনের যন্ত্রনায় এবং সন্তান ও সংসারের চাপে সৌন্দর্য নষ্ট হতে বসলো মেয়েটির। সংসারের চাকাকে সচল রাখতে হাড়ভাঙা খাটুনিতে স্বামী বেচারার হালও বেহাল। বাস্তবের ঊষর মাটিতে দাঁড়িয়ে চেহারা ভেঙে পড়া স্ত্রীর প্রতি ক্রমশ আকর্ষণ হারাল এক সময়ের মুগ্ধ স্বামী। ঠিক এমনি একটা সময় কথক 'আমি' সঞ্চিত অর্থ দিয়ে স্বামীকে একটা ড্রেসিং টেবল কিনে দিতে আব্দার করলে জুটল তীব্র বিদ্রূপ—

"যা চেহারা হয়েছে, আর ড্রেসিং টেবল কেনে না।"[১৪]

এই একটি মাত্র কথার ছুরিতে মৃত্যু হয় মেয়েটির সুখ স্বপ্ন। আশাহত মেয়েটি মেনে নেয় তার দৈনন্দিন জীবনকে। গল্পকারও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দলিল এঁকে দেন এই গল্পে।

বাংলা ১৩৮৯ সনে **'গর্ব'** গল্পটি রচিত হয়েছে। আজকের যুগে সততার মূল্য নেই। কেননা গাড়ি-বাড়ি-অলংকার-ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে সৎ থাকলে চলে না। যে মানুষগুলি চাইলেও অসৎ হওয়ার সুযোগ পায় না বা ঘুষ নিতে পারে না, পারে না অসৎ উপায়ে উপার্জন বাড়াতে, তারা অক্ষম অসহায় রাগে ভেতর ভেতর ছটফট করে। কেবলমাত্র পোশাকি সততার গর্বে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। 'গর্ব' গল্পে যেমন সান্ত্বনা খুঁজেছে অরুণা ও তার স্বামী। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই গর্ব করার প্রাসঙ্গিকতা আজ বড় বেশি। অসততা ও দুর্নীতির মাঝে শেষপর্যন্ত সততার বৃত্তে দাঁড়িয়ে থাকা মনোকষ্টের কারণ হলেও স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়ায় অ-দীন না হওয়ার মানসিক শান্তিও কম নয়।

অনগ্রসর উপজাতি-ও 'না-মানুষ'-দের ভাষ্যকর রমাপদ চৌধুরী–

অনগ্রসর উপজাতি-ও 'না-মানুষ'-দের নিয়ে রমাপদ চৌধুরী অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। তাঁর এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **'জলরঙ'** গল্পটির কথা। কোলিয়ারি জীবনকে কেন্দ্র করে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত গল্প 'জলরঙ'। অরণ্য অধ্যুষিত পাহাড়, জল-জঙ্গলে ঘেরা কোলিয়ারি অঞ্চলকে রমাপদ খুব কাছ থেকে দেখেছেন। রমাপদ-র বহু গল্পেই উঠে এসেছে কোলিয়ারির কথা। নিতান্ত পেটের দায়ে কোলিয়ারি শ্রমিক জীবন হাতে রেখে পাতালের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে তুলে আনে 'কালো হীরে'। জীবিকার অনিশ্চয়তাই নয় এদের জীবনেরও নেই কোন নিশ্চয়তা। একটু অসতর্ক হলেই খাদানের ধসে কিংবা ডিনামাইটের বিস্ফোরণে যে-কোন সময় প্রাণ হারাতে হয় এদের। শুধু তাই নয়, খনি ম্যানেজার, অফিসবাবু, ঠিকাদার থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি মহাজন পর্যন্ত এই সমস্ত কুলি-কামিন, রেজা-মুজুরদের শোষণ করে, এদের মা-মেয়ে-বউদের দিয়ে নিজেদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করে। আর নারী শ্রমিকের তো কোন কথাই নেই। এই গল্পের রূপমতীকে যেমন রেজার কাজ করতে এসে নিজের সম্ভ্রমকে নিলামে তুলে নিতে হয়। ভালোবাসার মানুষকে মাইন বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচাতে ঠিকাদার গোপী সিংয়ের রক্ষিতা হতে হয়। বাধ্য হয়ে অপবাদ দিতে হয় হিতৈষী বাঙালি 'হাজরিবাবুকে'। সকলের চক্রান্তে কাজ হারাতে হয় বাঙালিবাবুকে। "চোর লম্পট জুয়াড়ী, তিন নিয়ে কোলিয়ারি।"[১৫] —খনি কর্মচারী উপাধ্যায়ের এই কথার সারসত্য প্রমাণিত হয় এই গল্পে। গল্পের এই মূল বক্তব্যের পাশাপাশি গল্পকার কোলিয়ারি রেজাদের মধ্যে অসামান্য রূপবতী রূপমতীর কলঙ্কিত পিতৃ পরিচয়, ইজ্জত খুইয়ে 'মানকি' অর্থাৎ পঞ্চায়েতকে উৎকোচরূপে দুটো মুরগী ও এক হাঁড়ি মাণ্ডি দিয়ে রূপমতীর সমাজে ওঠা, পাঞ্জাবি মহাজনের হপ্তায় দু'টাকায় দু'আনা সুদ, ঠিকাদার আর খনি কর্মচারীর অবৈধ আয় ও যৌন লালসা, প্রেমিককে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে বলা, ঠিকাদার গোপীসিংয়ের রক্ষিতা হওয়ার অসহায়তা, বাঙালিবাবুর জীবিকা হারানো সবটাই বলে যান দরদী মন দিয়ে।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে **'রেবেকা সোরেনের কবর'** গল্পটি রচিত। ভ্রমণ পিপাসু রমাপদ রাঁচী, মুরী, রামগড়ের বিস্তৃর্ণ খনি অঞ্চলের উপজাতি মানুষ, খনি শ্রমিক ও মালিক, ফিরিঙ্গি সাহেব-সুবোদের জীবন-জীবিকা, প্রাত্যহিকতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিবিড় পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে এড়িয়ে যায়নি তাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতি, লোকাচার, অনাচার থেকে শুরু করে সাহেব, খুনি মালিক, উর্দ্ধতন কর্মচারীদের শাসন-শোষণ-প্রবঞ্চনা না কোন কিছুই। লেখকের সেই জীবন অভিজ্ঞতারই দরদি ফসল 'রেবেকা সোরেনের কবর।'

কারানপুরা কয়লাখনি অঞ্চল এই গল্পের পটভূমি। খনিতে কাজ করা সাঁওতালদের ভিড়ে মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতীর রূপ চোখে পড়ার মতো। শুধু রূপ নয় তার—হাটাচলা, কথাবার্তা থেকে শুরু করে দৃষ্টি চাউনি সবকিছু পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক। রূপমতী ভালোবাসে লালোয়া কুড়ুখকে। যদিও খনি সাহেব ফার্ণহোয়াইটের বাউন্ডুলে ছেলে ম্যাকুর সঙ্গে ভাব ছিল

রূপমতীর। ম্যাকুকে জড়িয়ে রূপমতীর নামে কুৎসার কানাঘুসা সাঁওতাল সমাজ মেনে নিতে পারেনি। কেননা সাঁওতালরা মনে করে—

> "সাহেব। ও হল আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধর্ম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ওই মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রেজিকে।"[১৬]

এমনিতেই সাঁওতাল সমাজ রূপমতীর উপর ফুঁসছিল। আগুনে ঘৃতাহুতি হল 'ভিখারিয়া নাচ' উপলক্ষ্যে। ভিখারিয়ার কবিগান আসলে 'ভিলেজ স্ক্যান্ডেলের' কাদা ছোঁড়াছুড়ি। এই আসরে রূপমতীকে নিয়ে গান বাঁধলো ভিন্‌গায়ের গায়েন কবিয়াল—

> "বাশরিয়ার রূপমতী, মোতির মতো তার রূপ। ঝিনুকের ভেতর যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি ছুপছাপ মন রূপমতীর। গরিবে কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মন-ছুপছাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিশ।"[১৭]

রূপমতীকে নিয়ে এই অশ্লীল গান সহ্য করতে না পেরে গায়েনকে লক্ষ্য করে লালোয়া কুড়ুখ কয়লার চাঙর ছুড়ে মারল। দুই গ্রামের মধ্যে এই নিয়ে বেঁধে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। সংঘর্ষে লালোয়াকে যেমন একটা হাত হারাতে হল, তেমনি প্রাণ বাঁচাতে ম্যাকু সাহেবের আশ্রয় নিতে হল রূপমতীকে। আগে থেকেই ম্যাকুকে জড়িয়ে রূপমতীর নামে রটনা ছিল। এই ঘটনায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। রূপমতীর উপর নেমে এল শাস্তির খাড়া। বুড়া চুন্দু হাঁসদা পঞ্চায়ের ডাকলো। বিচারে রূপমতীর 'বিটলাহা' হল। 'বিটলাহা' হল সাঁওতাল সমাজের বিচার ব্যবস্থায় চরমতম নিষ্ঠুর শাস্তি। যেখানে সাজাপ্রাপ্তকে শুধু সমাজচ্যুতই করা হয় না, লুঠ করা হয় তার ইজ্জতকেও। গ্রামের কিশোর, যুবক, বুড়ো সকলে মিলে ভোগ করে নির্মম ভাবে মেরে ফেলে সাজা প্রাপ্তকে। রূপমতীকে এই ভয়ানক শাস্তির হাত থেকে ম্যাকু সাহেব উদ্ধার করে। রূপমতী কৃতজ্ঞতায় ম্যাকুকে ভালোবেসে ফেলে। ম্যাকুকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত রূপমতীর নতুন পরিচয় হয় রেবেকা ফার্ণহোয়াইট। ম্যাকু সাহেবের ঘরণী রূপে রূপমতীর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। গর্বিত রেবেকা সুখী রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখল। কিন্তু রূপমতীর ভাগ্যে এই সুখ সইল না বেশিদিন। দুর্নীতি প্রমাণে চাকরি হারাতে হল ফার্ণহোয়াইটকে। পিতার বিপন্নতার সাথে সাথে বেকার ছেলে ম্যাকু প্রমাদ গুনলেন। পিতার পরামর্শ মতো ম্যাকু পিতার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে চলে গেলেন। রূপমতীকে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ম্যাকু চললেন পিতার সাথে। আর রূপমতী অর্ধাহারে, অনাহারে ম্যাকুর সন্তানকে কোলে নিয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন গুনল। ম্যাকু আর ফিরে এল না।

এরপর প্রাক্তন প্রেমিক লালোয়ার দেওয়া বিয়ের প্রস্তাব রূপমতী শুধু ফিরিয়ে দিলে না, সই সোনামিরুর সহায়তায় খাদানে কামিনের কাজ করে নিজের ও সন্তানের খাওয়ার ব্যবস্থার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল। মিথ্যা গর্বকে আকড়ে ধরে রূপমতী সোনামিরুকে বলল—

> "আমার না ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসাহেবের ইজ্জত খত্‌ম করতে চাস তুরা?"[১৮]

এমন করে ম্যাকুর ফিরে আসার আশায় দিন গুণতে গুণতে না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল রূপমতী। অবশ্য এর আগেই মৃত্যু হয় তার শিশুসন্তানের। মৃত্যুর পর কোন রকমে খ্রিষ্টান নিয়ম মেনে রূপমতীকে কবরস্থ করে একটা সামান্য কাঠের ক্রুশ পুঁতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খ্রিষ্টান পল্লীর সবাই তাকে ভুলে গেল। ভুলতে পারলো না কেবল লালোয়া কুড়ুখ আর সই সোনামিরু। রূপমতীর বিয়োগ ব্যাথায় লালোয়ার মন আজও কাঁদে নক্সীকাঁথার রূপাই মিঞার মতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লালোয়া রূপমতীর কবরের পাশে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যেত। কোন কোন দিন সই সোনামিরু এসে বসতো। দীর্ঘদিন লালোয়া কুড়ুখ ও সোনামিরুর রূপমতীর কবরের পাশে চুপচাপ বসে থাকা ও প্রদীপ জ্বালানোর দেখাদেখি একে একে সাঁওতাল পল্লীর সকলে এসে রূপমতীর কবরে প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করল। ক্রমশ শুরু হল মুরগি বলি, পৌষপর্বের নাচ—

> "ওঁরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিল রূপমতীর কবর, আরসেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধল সাদা আর কালো খ্রিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খ্রিস্টানরাই জিতল শেষ অবধি। রূপমতি নয়, রেবেকা ফার্ণহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।"[১৯]

প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে রূপমতীর মৃত্যুর করুণ ইতিহাস সময়ের ব্যবধানে এইভাবেই মিথে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পটির রচনাকাল খুঁজে পাওয়া যায়নি। আদিবাসী জন-জীবন সম্পর্কে লেখকের নিঁখুত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা আর বিস্তৃত জ্ঞানের মরমি উপাখ্যান 'ঝুমুরা বিবির মেলা'। আদিবাসী জনজাতিকে সামনে রেখে এই গল্পে লেখক যে যে বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন সেগুলি নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে—

এক. অনালোকিত ইতিহাসের ঘটনাকে প্রচারের আলোক বৃত্তে নিয়ে এলেন—

> "বোধহয় কোনও প্রাচীনকালে তুর্কী সৈন্যের আগমন ঘটেছিল এই অরণ্যাঞ্চলে, আর সেইজন্যেই মুসলমানদের নাম হয়েছিল তুড়ুক। যেমন হিন্দুদের নাম ছিল দেকো। একরামপুরের তুড়ুক চাষীরা এককালে ছিল বনচর মানুষ। চাষের ক্ষেত্রে স্থায়ী ডেরা বেঁধে কিভাবে যেন মুসলমান হয়ে যায়। অবশ্য নামেই তুড়ুক, আচারে বিচারে সিকিভাগ মুসলমানী, বারো আনা সাঁওতালী। মুখে সেই সাঁওতালীর রড়, উর্দুর ছিটেফোঁটা মেশানো। দেবদেবী সেই কিঁসাড় বোঙা, হাড়াম বোঙা, রামসালগি লিটা, জমসিম বোঙা। কিন্তু ওপারের লোক যেমন বলত সবচেয়ে বুড়া হল সিঙে বোঙা, তেমনি তুড়ুকদের সবচেয়ে বড় দেবতা এল্লা বোঙা।"[২০]

দুই. ডাইন ফোকসিনে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস—

> "ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মতো মেয়েও ছিল ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিল মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিল, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে, তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না। ... মাকে ভাগ না দিয়ে নির্মল সিংকে খেয়ে নিয়েছে বলে ঝুমরা বিবি মেয়ের বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে।"[২১]

তিন. সন্তানের প্রতি পিতার অকৃত্রিম স্নেহ—

> "বাপের কাছে মাঝরাত্তিরে গিয়ে বলেছিল, এবার জান বাঁচিয়ে পালাতে দে, ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস দেখব। ... বাপের প্রাণ তো। সেই ডেডবডিটাই বুধনের বলে চালিয়ে দিলে। ... বুড়ো ভেবেছিল খুনের দায়ে ফাঁসি হবে ওর। আর ফাঁসি হলে তখন বাপের কলিজা বেটার বুকে এসে ঢুকবে। ডাইনি তখন ওর ছেলেকে দিয়ে যা খুশী করাতে পারবে না।"[২২]

চার. প্রচলিত লোকঘটনা কখনো সখনো মিথে পরিবর্তিত হয়—

> "এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোকমেলা বসায়— ঝুমরা বিবির মেলা। ... চার পাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা বিবি আর মিঞামাঝির নামে। এল্লাবোঙার পুজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা আর অন্যটার মিঞামাঝি— তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়। যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যে বারে মিঞামাঝি মোরগটার চোট লাগে, সেবারে এল্লা বোঙার পুজো চলে সাতদিন ধরে। গাঁয়ের লোকের মুখ শুকিয়ে যায়।"[২৩]

'নারীরত্ন' গল্পটি রচিত হয়েছিল **১৩৬২** বঙ্গাব্দে। অবৈধ প্রেমিক ধুলনকে বাঁচাতে ময়না তার স্বামী ভুখন কিস্কুকে খুন করে। অথচ ময়নার অনুরোধে ধুলন যখন মৃতদেহ সোনা তুলসী নদীর জলে ফেলতে রাজি না হয়, তখন নিজেকে বাঁচাতে ময়না কিস্কু ধুলনকেই মিথ্যে খুনের অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয়। ধুলনের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার বেশকিছু দিন পরে ময়নার মেয়ে, মায়ের নিষ্ঠুরতায় ও ডাইনি সন্দেহের ভয়ে আসল সত্য দারোগা সুধীরবাবুকে খুলে বলে। সুধীরবাবু অনুমান করেন ধুলন হয়তো সত্যি সত্যি ময়নাকে ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসার নারীই যখন তাকে মিথ্যা অপরাধে ফাঁসাতে চাইলো তখন অভিমানি প্রেমিক মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করলো।

এই গল্পের ময়না আত্মসুখসর্বস্ব ভোগী নারী। জীবনকে অপরিসীম মমতায় ভালোবেসেছে বলেই আপন অপরাধের দোষ প্রেমিকের উপর চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। আত্মসুখসর্বস্ব ভোগী মানুষ আপন স্বার্থে যে কতখানি নীচে নেমে যেতে পারে এই গল্প তারই প্রমাণ।

মূক পশুকে কেন্দ্র করে প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্রের গল্প লেখার ধারায় আরও একটি সংযোজন রমাপদ-র **'আহ্লাদী'** (১৩৬৭)। আহ্লাদী নামের হরিণ শিশুকে সামনে রেখে নারী-পুরুষের আদিম জৈব আকর্ষণের চিরকালীনতা রমাপদ এই গল্পে তুলে ধরেছেন। ঋতুসতী আহ্লাদীকে এক সময় মাণ্ডির নেশাও ঘরে আটকে রাখতে পারে না। মিলন ঋতুতে বনের পুরুষ হরিণের ডাকে সাড়া দিয়ে পোষ্য আহ্লাদী ঘর ছেড়েছে। ঠিক যেমন ময়না চৌকিদারের মেয়ে রংলি, যে এক সময় অঘোন বল্লমীকে ভয় পেত, সেই রংলিই যৌবনে পা রেখে বন্য প্রকৃতির নিষাদ অঘোনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ

অনুভব করেছে। অঘোনের ডাকে আহ্লাদীর মতোই চঞ্চল হয়ে ওঠে রংলি। জল ভরার অজুহাতে দেখা করে অঘোনের সাথে। অঘোনের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে রংলি। সভ্যসমাজ থেকে দূরে বাস করা এই মানুষগুলির প্রকৃতি বন্য। যেমনভাবে ময়না চৌকিদারের বউ স্বামী-পুত্র-কন্যা ফেলে রেখে জৈব আকর্ষণের টানে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল, রংলিও তেমনভাবে অঘোনের সাথে চলে যেতে চায়।

'আহ্লাদী' গল্পে রমাপদ, মানুষ ও বনের পশুর মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয়ন যেমন দামু-আহ্লাদী ও অঘোনের ত্রিকোণ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দেখান, তেমনি রংলি ও অঘোনের পারস্পরিক জৈব আকর্ষণের ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নেন।

'**উত্তরাধিকার**' গল্পটির রচনাকাল জানা যায়নি। ছত্রিশগড়ের রাউত, রয়তাইনদের জীবন-জীবিকা, প্রেম-ভালোবাসা, সন্তানাকাঙ্ক্ষা সবটাই নির্লিপ্তভাবে গল্পকার এই গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পকার জানিয়েছেন, ওদের সমাজে কন্যার পিতাকে কন্যাপণ দিয়ে বরকে বিয়ে করতে হয়। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খেটে খায়, এমনকি স্ত্রী'র রোজগারে সংসার চালানোর মধ্যেও ওদের পুরুষদের কোন গ্লানি নেই। ওদের মেয়েরা যেমন স্বামী বা ভালোবাসার পুরুষকে গভীরভাবে ভালোবাসে তেমনি বে-খেয়ালি শরীরী আকর্ষণে কিংবা বঞ্চিত মাতৃত্বের কারণে অবৈধ শরীরী সম্পর্কে লিপ্ত হয়েও স্বামীর সংসারে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। এই গল্পে যেমন ছত্রিশগড়ী রাউতের ভালোবেসে বিয়ে করা বউ, অতৃপ্ত মাতৃত্বের কারণে কেবলমাত্র সন্তান পাওয়ার জন্য গোরা পল্টনের সাথে অবৈধ দেহ সম্পর্কে লিপ্ত হতে দ্বিধাগ্রস্ত না হয়েও স্বাভাবিক ঘর সংসার করেছে। গল্পকার এই ঘটনার নিরিখে বলেছেন, ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ দেশের রক্তমাংসে শরাবীর গর্ভে গোরা পল্টনের অবৈধ সন্তান উত্তরাধিকার পরিবর্তনের পথ রচনা করে চলবে।

শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক বা অনগ্রসর উপজাতি ও না-মানুষদের নিয়ে রমাপদ চৌধুরী গল্প লেখেননি। তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্যে ভরা। অবশ্য একাধিক বিষয় নিয়ে তিনি গল্প রচনা করলেও তাঁর গল্পের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে মধ্যবিত্তের কথা। খড়গপুর রেল শহরে বেড়ে ওঠা এবং অরণ্য ও খনিজ অধ্যুষিত ঝাড়খন্ডের রাঁচি, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ এবং ছত্তিশগড়ের বিলাশপুর সন্নিহিত অঞ্চলে জীবনে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসা রমাপদ চৌধুরীর গল্পে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষজনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। সঙ্গত কারণেই সীমাবদ্ধ এই আলোচনায় বেছে নেওয়া হল এই শ্রেণীর গল্পগুলিকে। রমাপদ চৌধুরীর গল্পকার সত্তার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারই এই লেখার উদ্দেশ্য।

সূত্রনির্দেশ :

১. চৌধুরী রমাপদ, 'উদয়ন্তি', গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃঃ ১।
২. উদয়ান্ত, তদেব, পৃঃ ৪।
৩। উদয়ান্ত, তদেব, পৃঃ ৩।
৪। উদয়ান্ত, তদেব, পৃঃ ৫।
৫। রত্নকূট, তদেব, পৃঃ ৫।
৬। রত্নকূট, তদেব, পৃঃ ৬।
৭। রত্নকূট, তদেব, পৃঃ ১১।
৮। সহযোগ, তদেব, পৃঃ ১৭।
৯। জ্বালাহর, তদেব, পৃঃ ১১৪।
১০। জ্বালাহর, তদেব, পৃঃ ১১৪।
১১। সম্ভব অসম্ভব, তদেব, পৃঃ ২৫০।
১২। মনবন্দী, তদেব, পৃঃ ২৮৭।
১৩। মনবন্দী, তদেব, পৃঃ ২৮৭।
১৪। ড্রেসিং টেবল, তদেব, পৃঃ ৬০০।
১৫। জলরঙ, তদেব, পৃঃ ২২০।

১৬। রেবেকা সোরেনের কবর, তদেব, পৃঃ ২৭০।
১৭। রেবেকা সোরেনের কবর, তদেব, পৃঃ ২৭১।
১৮। রেবেকা সোরেনের কবর, তদেব, পৃঃ ২৭৭।
১৯। রেবেকা সোরেনের কবর, তদেব, পৃঃ ২৭৮।
২০। ঝুমরা বিবির মেলা, পৃঃ ২৯৪।
২১। ঝুমরা বিবির মেলা, তদেব, পৃঃ ২৯৫।
২২। ঝুমরা বিবির মেলা, তদেব, পৃঃ ২৯৯।
২৩। ঝুমরা বিবির মেলা, তদেব, পৃঃ ২৯৯।

গ্রন্থপঞ্জী :

আকর গ্রন্থ :

চৌধুরী রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৪ (প্রথম সংস্করণ), ১৯৯৯, (দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ)।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) চৌধুরী রমাপদ, গদ্যসংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, ২০১১।
২) চৌধুরী রমাপদ, হারানো খাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, ২০১৫।
৩) চৌধুরী শম্পা, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০।

*****